গোপন তথ্য

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

অ্যান্ডি ডন। সেই নামেই পরিচিত সর্বত্র। আসল নাম অনাদি দাঁ, জানেন না সেটা কেউ। অনাবাসী ভারতীয়। বিশিষ্ট শিল্পপতি। কুড়ি বছরের ওপর পড়ে রয়েছেন আমেরিকায়। প্রথমে ওহিও-তে ছোট অফিস খুলেছিলেন, এখন অন্তত চোদ্দ-পনেরোটা জায়গায় অফিস। ছেলে সবে বছর পনেরো, মেয়ে আরও ছোট। বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত, মা মারা যাওয়ার সময় — না, যাবার সময় পান নি, বাবাকে আনার একটা চেষ্টা করেছিলেন, সফল হন নি। দেশে এই কুড়ি বছরের মধ্যে ক'বার গিয়েছেন গুনে বলতে পারেন। শেষ গিয়েছেন ন'বছর আগে। সেই অবধি ডন বলছেন একবার ইন্ডিয়ায় যেতে হবে, সুতরাং তাঁর ডান হাত মিকি র‍্যাচেল খুবই বিস্মিত, জিগ্‌গেস করলেন, 'এনি অক্কেশান?'

না, সেরকম কিছু নয়। এবার ইন্ডিয়ায় একটা ভেনচার করবো ভাবছি?'

'সফ্‌ট্ ওয়্যার? ভিডিওফোন?'

'না না, এখানে যা করেছি সেসব নয়, সামথিং নিউ। গারমেন্টস তৈরির একটা ফ্যাক্টারি খুলবো।'

স্টেঞ্জ! না, মুখে উচ্চারণ করে নি র‍্যাচেল, মনে মনে ভাবল। আসলে ইন্ডিয়ার সম্বন্ধে কোন উৎসাহই ছিল না তাঁর। এবার ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল দেখে, মুম্বইয়ের হট দুখানা মুভি দেখে বোধহয় ইচ্ছেটা জেগেছে। র‍্যাচেল ঘাড় চুলকে বললে, 'কেউ আপনাকে এ প্রস্তাব দিয়েছে?'

'নো, দ্য ডিসিশন ইজ মাইন। আয়্যাম ইন্টারেস্টেড ইন লেডিস গারমেন্টস ওনলি।'

'শুধু মেয়েদের! স্টেঞ্জ!' এবার শব্দটা বেরোল মুখ দিয়ে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল অবাক নয়, বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে। সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে, অ্যান্ডি বললেন, 'দা টু মুভিজ টেক দা ডিসিশন।'

'মুভিজ?'

'ইয়েস। হিন্দি সিনেমা। একটার শ্যুটিং হয়েছে নাথুলায়, অন্যটা সুইজারল্যান্ডে। এই ড্যামেজিং কোল্ডেও দেখলাম হিরোজ উইদ ইউনিফর্ম, বাট দা হিরোয়িনস আর মিজারেবলি ড্রেস্‌ড্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইন্ডিয়ায় এখন মেয়েদের পোশাক তৈরি করার কোন কোম্পানি নেই, আই ডোন্ট লাইক টু মিস দা অপারচুনিটি। এখুনি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেল রাচেল, বি কুইক। সিক্রেটটা অন্য কেউ টের পাবার আগেই।'

চোর

সনৎ বসু

—বল, কোথায় রেখেছিস?

—জানি না, সত্যি বলছি জানি না।

—জানিস, অবশ্যই জানিস। বল্ কারো কাছে বিক্রি করেছিস?

—বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার মোবাইল ছুঁই নি। বিপুল ঘোষের পা ধরতে যায় ফটিক।

অমনি বেমক্কা লাথি বিপুলের। ছিটকে পড়ে দেওয়ালে কপাল ঠুকে যায় ফটিকের। রক্তের ফিন্‌কি।

তাতেও রেহাই নেই। দৌড়ে এসে জামার কলার চেপে ধরে বিপুল।

—এখনো সময় আছে বলে দে। নইলে তোকে...

সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে জামায়। তের বছরের ফটিক কী করবে বুঝতে পারে না। না বললে আরো মার। হ্যাঁ বললে মোবাইল ফেরত দেয়ার ঝুঁকি।

ফটিক সময় নেয়। কিন্তু বিপুলের সময় দেবার ধৈর্য নেই।

মোবাইলটা গত মাসে কেনা। ষোলো হাজার টাকায়। অন্য মোবাইলের সঙ্গে ওটাও ছিল টেবিলের উপর। গত রাতে সুভাষ, টিঙ্কু আর শ্যামল এসেছিল ব্যবসার কাজে। অনেক রাত পর্যন্ত খানাপিনা হয়েছিল।

গলা পর্যন্ত পান করে টিঙ্কুর এমন অবস্থা যে হাঁটার ক্ষমতা নেই। অগত্যা প্লাবন ওকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল।

সবাইকে খাবার সার্ভ করেছিল ফটিক। টেবিল পরিষ্কার করে নিজে খেতে বসতে রাত আড়াইটে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বিপুলের চিৎকার। টেবিলে দামী মোবাইলটা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন পাওয়া গেল না, তখন স্বপ্ন বলল, 'ফটিককে ধরো।'

মাত্র ছ-মাস আগে বিধবা মা-র অনুরোধে ছেলেটাকে দেড় হাজার টাকার মাস মাইনেতে কাজে নিয়েছে বিপুল।

আবার মার। হাতের কাছে পাওয়া স্টিলের রোলার দিয়ে। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি আর হুমকি।

ফটিকের গলায় কোন আওয়াজ নেই। নেতিয়ে পড়েছে মেঝেতে। এবার রক্ত ঝরে নাক বেয়ে। টুপ্...টুপ্...।

আর মেরো না, মরে যাবে। স্বপ্নার সতর্ক বার্তা।

রোলারটা বাইরে ছুঁড়ে ক্রুদ্ধ বিপুল চেয়ারে এসে বসে।

অনেক ইম্‌পর্টেন্ট নাম্বার ছিল ওর মধ্যে। না পেলে বিজনেসের ক্ষতি। বিপুল আবার ঠান্ডা মাথায় রাতের ঘটনাক্রম সাজায়। তাতেও সব সন্দেহ ফটিকের উপর। কারণ ও ছাড়া তো ঘরে অন্য কেউ ছিল না।

বিপুল এবার ফটিকের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে। পিঠে হাত রেখে বসানোর চেষ্টা।

—ফটিক শোন, তোকে পাঁচ হাজার টাকা দেব। মালটা বের করে দে। সোনা বাপ্ আমার। কাউকে বলব না। পুলিশে দেব না।

ফটিক যে কে সেই। হাত সরাতেই মেঝেতে গড়ায়। চোখ খোলে না। কথা বলে না।

তখনি ঘরে বেজে ওঠেন রবি ঠাকুর: 'আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা...

দৌড়ে এসে ফোন ধরে স্বপ্না।

—টিঙ্কু বলছি ম্যাম্। বিপুলদাকে দিন।

—বল। বিপুলের গম্ভীর গলা।

—সরি বস্। কাল মালের ঘোরে নিজেরটার সঙ্গে তোর দামী সামসুঙটাও পকেটে ভরে নিয়েছিলেন। ডোন্ট মাইন্ড। এক্ষুনি ড্রাইভার দিয়ে পাঠাচ্ছি।

বিপুল স্বপ্নার দিকে তাকায়।

স্বপ্না ফটিকের দিকে।

হেড ডাউন করা

মানস রঞ্জন গুপ্ত

মা রমিতার হাত ধরেই বাড়িতে ঢুকল মিতুল। বইএর ব্যাগটা রমিতার হাতে। ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে এক দৌড়ে উঠে এল বারান্দায়। দাদু আর ঠাকুমা বসে আছেন ওরই অপেক্ষায়।

—এই ত দিদিভাই এসে গেছে।

—কাল যাব না স্কুলে। কিছুতেই না। পিঠ ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।

—পিঠে ব্যথা কেন? আয় ত আমার কাছে।

মিতুল চুপচাপ দাদুর কোলে উঠে বসল। রমিতা একবার মিতুলের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ওর শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিল।

—আরে না না। ওসব কিছু হয় নি। আপনাদের নাতনিক বেয়াড়া আবদার।

তারপর ঘরে ঢুকে গেল। এইবার মিতুল প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

—আজ সবসময় হেড ডাউন করে ছিলাম। প্রথম থেকে শেষ অব্দি।

হেড হাউন করে থাকার মানে দাদু ও ঠাকুমা দুজনেই এখন জানেন। আগে এসব কথা শোনেন নি কখনও। কিন্তু মিতুল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে শুনছেন। টিচার না আসলে বাচ্চাদের মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকতে বলা হয় নিজেদের সিটেই। কোনরকম নড়াচড়া করতে পারবে না। পড়া না পারার শাস্তি নয়। ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আবিষ্কৃত একটি আধুনিক পদ্ধতি। একটা শিশুকে অকারণে চুপচাপ বসিয়ে রাখা! তাও আবার ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে হবে। পায়ের কাছে মেঝে বাদা আর কিছুই দেখতে পাবে না। ওনারা দুজনেই বোঝেন - কী মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে শিশুদের বিনা অপরাধে।

মিতুলের দাদু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

—কেন? আজও তোদের টিচার আসে নি?

—আজ 'এ' সেকশানের স্যার আসেন নি। 'সি' সেকশনেরও মিস্ আসে নি। 'বি' সেকশনের মিস্ তিনটে সেকশনেই ঘোরাঘুরি করছেন। আমাদের বলেছেন হেড ডাউন করে থাকতে।

—কিছুই পড়ায় নি?

ঠাকুমার এই প্রশ্নে মিতুল মাথায় হাত দিল।

—কী যে বল ঠাম্মি! একজন মিস্ তিনটে সেকশনে কিভাবে পড়াবেন?

দাদু চিৎকার করে উঠলেন।

—বউমা, শুনবে একবার?

রমিতা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

—কিছু বলবেন, বাবা?

—কী হচ্ছে এসব? স্কুলে পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি বাচ্চারা হেড ডাউন করে বসে আছে।

—তা আমি কি করবো? স্কুলের ডিসিপ্লিন-

—শুধুই ডিসিপ্লিন! এত টাকা মায়না দিচ্ছি কি শুধু হেড ডাউন করে বসে থাকার জন্য?

রমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর উত্তর দিল।

—এবার টিচাররা মাঝে মাঝেই ডুব দিচ্ছে। আগে এরকম ছিল না। সবাই টিউশন পড়ায় বাড়িতে। স্কুলে পড়ায় না। কিন্তু আপনি ওর সামনে এসব বলছেন কেন? ও আস্কারা পেয়ে যাবে। অন্য বাচ্চারাও ত কষ্ট করছে।

—বুঝলাম। কিন্তু তোমরা মা-বাবারা কি করছ? গাদা গাদা টাকা মায়না দিচ্ছ প্রতিবাদ করতে পার না?

রমিতা ঠোঁট ব্যাঁকাল।

— এ রাস্তার পাশে প্রাইমারি স্কুল নয়, বাবা। এখানে ডিসিপ্লিনই আসল। কথায় কথায় প্রতিবাদ করা যায় না। বেশি কথা বলতে গেলে মিতুলকে টি.সি. দিয়ে দেবে। না হয় পরীক্ষায় কম নম্বর দেবে।

রমিতা আবার ঘরে ঢুকে গেল। মিতুলের দাদু বুঝলেন - হেড ডাউনের সমস্যা আরও অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে।

টেলি বাজার

অলোক মুখোপাধ্যায়

গৃহস্থের সংসারে নতুন এক বিড়ম্বনা শুরু হয়েছে মাসখানেক। বাড়ির ল্যান্ডলাইনে প্রতি সপ্তাহে তিন থেকে চারটি কল আসছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যপ্রান্তে মিষ্টভাষী নারীকণ্ঠ। ওয়াটার পিউরিফায়ার, ইনসিওরেন্স, স্বাস্থ্য পরিষেবা অথবা ইনভেসটমেন্ট স্কীম ইত্যাদি লোভনীয় অভার। গৃহিনী হ্যাঁ না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখেন। একদিন ভরদুপুরে টেলিফোন - 'হ্যালো ম্যাম অনুরাগ বলছি। গত পরশু শ্রেয়া আপনাকে হেলথ চেক আপের কমবো অফার যেটা দিয়েছিল সেটা নিয়ে কিছু ভাবলেন? অফারটা কিন্তু দারুণ, একজনের খরচায় দুজনের হয়ে যাবে।' ঘুমের ঘোরে গৃহিণী রিসিভার নামিয়ে রেখে যে যাত্রা রেহাই পেলেন।

সন্ধ্যেবেলায় আবার কল। এবার ফোন ধরেন গৃহকর্তা এবং অন্যপ্রান্তের কণ্ঠকে কোন সুযোগ না দিয়ে দাপটের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

স্বাস্থ্যজনিত কোন সমস্যা আমাদের নেই। বুড়ো বয়সে হাঁটুর ব্যাথা, গ্যাস অম্বল, মাথা-ঘোরা ছাড়া অন্য কিছু নেই, অতএব হেলথ চেক্ আপে আমরা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই।

অন্যপ্রান্তে মহিলা কণ্ঠস্বর সাবলীল ভঙ্গিমায়— স্যার আমি সেলফ্ হেলপ্ ট্যুরিজম থেকে অনুপ্রিয়া বলছিলাম। বয়স্কদের জন্য আমাদের অভিনব কিছু ট্যুর প্যাকেজ রয়েছে।

গৃহকর্তা কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও নিজেকে সামলে নেন।

—সরি, কদিন ধরে হেল্থ নিয়ে চলছিল কিনা তাই ভাবলাম এবারেও হেলথ্ প্যাকেজ। এনিওয়ে আমাদের নিজস্ব বেড়ানোর একটি গ্রুপ রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সব ব্যবস্থা করে দেয়, আমরা মজা করে ঘুরে বেড়াই। অন্যপ্রান্তে এবার পুরুষ কণ্ঠ।

—নমস্কার স্যার আমি রাজর্ষি। অনুগ্রহ করে দু মিনিট সময় দিন প্লীজ। বেড়ানোর সমস্ত রকম ঝক্কি ঝামেলা আমরা সামাল দিই। স্পেশালি এলডারলি পিপ্ল লাইক ইউ।

গৃহকর্তা কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

—যতো সব বেকার বাউন্ডুলে। এর পরেই ট্রাভেল ইনসিওরেনসের অথবা ফ্রি অ্যাকসিডেন্টাল কভারেজের গল্প শোনাত। শোন গিন্নি এবার থেকে যত্রতত্র টেলিফোন নম্বর দেওয়া বন্ধ কর।

গৃহিণীর কণ্ঠে অনুযোগের সুর। আমি আবার কাকে নম্বর দিলাম।

—মনে করে দ্যাখো। আগের মাসে এক কিচেন চিমনি কোম্পানির সেলস্ম্যান এসেছিল। এই কথা সেই কথার পর তোমার কাছ থেকে ফোন নম্বর জেনে নিয়েছিল। সব এক সুতোয় বাঁধা বুঝেছো। মার্কেট সার্ভের নামে শিকার ধরার ধান্দা। এর পোশাকী নাম টেলি মার্কেটিং।

ও সাহেব, আগে জমির ঢাল চেন

সজল দাশগুপ্ত

প্রথম যখন বাঁধটা ভাঙে তখন ব্লক থেকে একজন ওভারসিয়ার এসেছিল শুধু। সামান্য কাজ, ছোট ভাঙন। তাই ছোট ইঞ্জিনিয়ার। কাজ সম্পূর্ণ করে তিনি চলে গেলেন। এক মাস বাদে বর্ষা এল। ডি.ভি.সি জলও ছাড়ল। নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। বাঁধটা ভেঙে গেল। দশটা গাঁ জলের তলায় চলে গেল। পরের বছর ওভারসিয়ার এলো না, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এলেন। মেরামত শেষ করে চলে গেলেন। তারপর বর্ষণ এল। ডি.ভি.সি. জল ছাড়ল। বাঁধ ভাঙল। আবার দশটা গাঁ ডুবল। মহা মুশকিল। পরের বছর আরও বড় ইঞ্জিনিয়ার এলেন। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও যুৎসই করে বাঁধ মেরামত করে গেলেন। কোথায় কি? সেবারই গেল।

ইঞ্জিনিয়ারদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। রাতের ঘুম নেই। এবার আর সরকার কোন ঝুঁকি নিলেন না। সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার যিনি, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এত এত ডিগ্রী তাঁর বিলেতে পড়াশুনো, সরকার তাঁকে পাঠালেন। তিনি এসে জোর কদমে কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁবু খাটিয়ে তিনি মাঠেই রয়ে গেলেন। নড়লেন না। ইটবালি, সিমেন্ট সবকিছুর তদারকি তাঁর নিজের। কাউকে বিশ্বাস নেই।

বুড়ো এক চাষি আছে ও গাঁয়ে। খুব বুড়ো। এই ক' বছর ধরে বুড়ো এসে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধ মেরামতের কাজ দেখত। আর আপনমনে বিড়বিড় করত। কেউ তার কথা শুনতেই না। এবার বুড়ো মরিয়া হয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারকে পাকড়াও করল— 'ও সাহেব, বছর বছর এত এত টাকা ঢালছ বাঁধ সারাতে। কাজত কিচ্ছু হচ্ছে না। এবারও হবে না। হবে কি করে? জমির ঢালটাই ত জান না।' বুড়ো চাষি খুব বিরক্ত। আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে আর একবার পেছন ফিরে গলা চড়িয়ে বলে —'ও সাহেব, আগে জমির ঢাল চেন!' হন্ হন্ করে, বুড়ো এবার হাঁটে। এতেও যদি কাজ না হয় তো গোল্লায় যাক সব।